ইউনিট
৭

ডেয়রী ভিত্তিক সমন্বিত খামার

ভূমিকা

আমাদের দেশে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও দারিদ্র দূরীকরণে ডেয়রী ভিত্তিক সমন্বিত খামারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশে ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির খামার গড়ে উঠার পেছনে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ ও মাংসের চাহিদা। একজন সুস্থ্য মানুষের প্রতিদিন ২৫০ মি.লি. দুধ এবং ১২০ গ্রাম মাংস খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এত খামার হওয়ার পরেও এই বিশাল জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত সম্ভব হচ্ছে না। আশা করা যায়, ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির খামার গড়ে উঠার মাধ্যমে পুষ্টি চাহিদা অনেকাংশে পূর্ণ হবে। এর মাধ্যমে একটি সুস্থ ও মেধাবী জাতি গড়া সম্ভব হবে। সুতরাং ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণি সম্পর্কে জানতে হলে গাভী পালন, মহিষ পালন, ছাগল পালন, ভেড়া পালন ইত্যাদি সম্পর্কেও জানা আবশ্যক।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির সম্ভাবনা ও গুরুত্ব, দুগ্ধবতী গাভীর স্বাস্থ্য সম্মত লালন পালন ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ, মহিষ পালন, ছাগল পালন, ভেড়া পালন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৭.১ : ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির সম্ভাবনা ও গুরুত্ব
পাঠ - ৭.২ : দুগ্ধবতী গাভীর স্বাস্থ্য সম্মত লালন পালন ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
পাঠ - ৭.৩ : দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ
পাঠ - ৭.৪ : মহিষ পালন
পাঠ - ৭.৫ : ছাগল পালন
পাঠ - ৭.৬ : ভেড়া পালন

পাঠ-৭.১ ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির সম্ভাবনা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির সম্ভাবনা

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণি, যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া লালন-পালনের সঙ্গে জড়িত। দেশের মানুষ এ পেশার সঙ্গে জড়িত হওয়ার ফলে এদের সম্পর্কে সহজেই পরিচিত হতে পেরেছে। বর্তমানে এদেশের গ্রামাঞ্চলে, শহরে, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছে ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির খামার। বর্তমান সময়ে ডেয়রী শিল্প জনগনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং এ শিল্পের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলছে। দারিদ্র বিমোচন, বেকার সমস্যার সমাধান ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ, নারীর ক্ষমতায়ন, জ্বালানী ও সারের উৎস হিসেবে গবাদি প্রাণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মানুষের স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ও মেধাবী জাতি গঠনের জন্য খাদ্যে পরিমিত পরিমাণ দুধ ও মাংসের প্রয়োজন। ডেয়রী প্রাণি লালন-পালন বর্তমানে জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় পেশা হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এতে স্বল্প পুঁজি প্রয়োজন হয় ও অল্প সময়ে লাভ করা যায়।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। বর্তমানে দেশে অসংখ্য শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবমহিলা রয়েছে। এই বিশাল বেকার জনগোষ্ঠির জন্য ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণি এবং ডেয়রী শিল্প হয়ে উঠতে পারে একটি আদর্শ আত্মকর্মসংস্থানের জায়গা।

দেশে ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির খামার গড়ে উঠার পেছনে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ ও মাংসের চাহিদা। একজন সুস্থ্য মানুষের প্রতিদিন ২৫০ মি.লি. দুধ এবং ১২০ গ্রাম মাংস খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এত খামার হওয়ার পরেও এই বিশাল জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত সম্ভব হচ্ছে না। আশা করা যায়, ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির খামার গড়ে উঠার মাধ্যমে পুষ্টি চাহিদা অনেকাংশে পূর্ণ হবে।

দেশে ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণি উন্নয়নের সম্ভাবনা বিগত বছরগুলোতে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে অসংখ্য ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির খামার গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি এসব খামার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আমিষজাতীয় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে সরকারীভাবে যথাযথ গুরুত্ব ও আর্থিক বরাদ্দসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে গবাদি প্রাণির উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির উন্নয়নের মাধ্যমেই দুধ ও মাংস প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে, দারিদ্রতা হ্রাস সম্ভব হবে এবং গ্রামীণ গরীব জনগোষ্ঠীর আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণি উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও মেধাবী জাতি গড়া সম্ভব হবে।

ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির গুরুত্ব

মানুষের খাদ্য সরবরাহ, পুষ্টির চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণি, যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে গবাদি প্রাণির নানাবিধ গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১. জমি চাষ করতে, শস্য মাড়াই করতে এবং পণ্য পরিবহনে গবাদি প্রাণি ব্যবহৃত হয়।
২. তেলের ঘানি, আখ মাড়াই মেশিন ইত্যাদি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় শক্তি গবাদি প্রাণির মাধ্যমে পাওয়া যায়।
৩. কোন কোন গবাদি প্রাণি যেমন- ছাগল ও ভেড়া পালনে মূলধন কম লাগে। এদের খামার করে অনেক বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
৪. গবাদি প্রাণির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প যেমন: খাদ্য ও ঔষধ ইত্যাদি শিল্প গড়ে ওঠে এবং অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
৫. গবাদি প্রাণি বিক্রয় করে এককালীন অনেক অর্থ পাওয়া যায়।

৬. গবাদি প্রাণি এবং তাদের মাংস ক্রয়-বিক্রয় করে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়।
৭. প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস হল গবাদি প্রাণির মাংস ও দুধ।
৮. দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রি করে প্রচুর অর্থ আয় করা হয়।
৯. গবাদি প্রাণির চর্বি সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
১০. গবাদি প্রাণির গোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
১১. গবাদি প্রাণির মলমূত্র উৎকৃষ্ট জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহৃত হয়।
১২. গোবর থেকে বায়োগ্যাস তৈরি করে জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা যায়।
১৩. ভেড়া-ছাগলের পশম দ্বারা দামী শীতবস্ত্র তৈরি করা হয়।
১৪. গবাদি প্রাণির চামড়া, পশম, হাঁড় ইত্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়।
১৫. গবাদি প্রাণির উপজাত দ্রব্য যেমন রক্ত, নাড়িভুড়ি বিশেষ ব্যবস্থায় প্রক্রিয়াজাত করে পাখি ও মাছের খাদ্য তৈরী করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির সম্ভাবনা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবে।

সারাংশ

ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণি, যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের খাদ্য সরবরাহ, পুষ্টির চাহিদাপূরণ, দারিদ্র বিমোচন, বেকার সমস্যার সমাধান ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ, নারীর ক্ষমতায়ন, জ্বালানী ও সারের উৎস হিসেবে গবাদি প্রাণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে সরকারীভাবে যথাযথ গুরুত্ব ও আর্থিক বরাদ্দসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে গবাদি প্রাণির উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন প্রাণিটি একই গ্রুপ ভুক্ত নয় -
ক) ছাগল খ) ভেড়া
গ) মহিষ ঘ) উট

২। নিচের কোন্‌টি ডেয়রী ভিত্তিক গবাদি প্রাণির জন্য সত্য নয় -
ক) চামড়া রপ্তানি করা যায় খ) হাড় রপ্তানি করা যায়
গ) পালক রপ্তানি করা যায় ঘ) পশম রপ্তানি করা যায়

পাঠ-৭.২ দুগ্ধবতী গাভীর স্বাস্থ্য সম্মত লালন পালন ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালনের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- দুগ্ধবতী গাভীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বলতে এমন কতগুলো স্বাস্থ্যগত বিধিব্যবস্থাকে বোঝায় যা এযাবৎকাল সারা পৃথিবীতে প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এগুলো হলো-

১. বাসস্থান নির্মাণে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও দুর্যোগ নিবারণ করা,
২. খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা,
৩. প্রজনন ও প্রসবে জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা,
৪. মলম নিষ্কাশন করা,
৫. অসুস্থ গাভী পৃথকীকরণ ও মৃত গাভীর সৎকার,
৬. নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা,
৭. সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

নিম্নে এগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. বাসস্থান নির্মাণে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও দুর্যোগ নিবারণ করা

গোশালা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে গাভীর জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকে। একই সাথে এতে গাভীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করারও ব্যবস্থা থাকতে হবে। যে কোনো মধ্যম আকারের গাভী প্রতিদিন ৯০.১ কেজির (২০০ পাউন্ড) অধিক বাতাস গ্রহণ করে। প্রশ্বাসকৃত বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (CO_2) আধিক্য ০.০৩% থেকে ৫.৫৩%-এ উন্নীত হয়। আর অক্সিজেনের পরিমাণ ২০.৯৪% থেকে ১৪.২৯%-এ কমে যায়। একটি গাভী থেকে অন্যটি কমপক্ষে ১.৫ মিটার (৫ ফুট) দূরে রাখা উচিত। গোশালা নির্মাণের সময় এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। গোশালার জায়গা বরাদ্দও এই ভিত্তিতেই করতে হবে। এতে গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

২. খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

খাদ্য ও পানির পাত্র সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কারণ, পাত্র অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা থাকলে এতে সহজেই বিভিন্ন রোগজীবাণু বাসা বাঁধবে ফলে গাভীর রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কাজেই এই দিকটায় বিশেষ নজর দিতে হবে।

৩. প্রজনন ও প্রসবে জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা

প্রজনন ও প্রসবের মাধ্যমে গাভীতে রোগব্যাধি ছড়াতে পারে। সাধারণত প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ষাঁড়ের মাধ্যমে প্রজনন করালে এই সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। কৃত্রিম প্রজননে রোগব্যাধি ছড়ানোর প্রকোপ অনেক কমে যায়। কিন্তু তা যদি জীবাণুমুক্ত পদ্ধতিতে করা না হয় তাহলে রোগব্যাধি ছড়াতে পারে, বিশেষ করে যৌন রোগসমূহ। সুতরাং কৃত্রিম প্রজননের প্রতিটি পদক্ষেপ নির্জীবাণু পদ্ধতিতে করতে হবে। তবেই যৌনব্যাধি ছড়ানো বন্ধ হতে পারে। তাছাড়া প্রসবকালেও যথারীতি ধাত্রীবিদ্যার নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে গাভী রোগজীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে। প্রতিটি ডেয়রি ফার্ম বা পারিবারিক দুগ্ধ খামারে জীবাণুমুক্ত ধাত্রীকক্ষ রাখতে হবে। নির্জীবাণু পদ্ধতি ব্যবহারের সর্বোত্তম পন্থা হলো পরিষ্কার ও ফুটানো পানি দিয়ে যন্ত্রপাতি ধৌত করা। বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালিত বড় দুগ্ধ খামারগুলোতে অটোক্লেভ (autoclave) নামক যন্ত্র দিয়ে যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করা হয়।

৪. মলমূত্র নিষ্কাশন করা

ডেয়রি ফার্ম বা পারিবারিক দুগ্ধ খামার যেখানেই গাভী লালনপালন করা হবে সেখানেই মলম নির্গমণ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। গাভীর বাসস্থানে সেরকম নর্দমা ও পয়ঃপ্রনালী তৈরি করতে হবে যাতে মলম উপজাত হিসেবে সার বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করা যায়। প্রতিদিন অন্তত একবার পানি ঢেলে গোশালা পরিষ্কার করতে হবে। মাসে অন্তত একবার জীবাণুনাশক ওষুধ, যেমন- ফিনাইল (phenyle) বা আয়োসান (iosan) দিয়ে শোধন করতে হবে। এতে মলম থেকে গাভীতে রোগব্যাধি ছড়ানো ও পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

৫. অসুস্থ গাভী পৃথকীকরণ ও মৃত গাভীর সৎকার করা

যে কোনো দুগ্ধ খামারে মৃত গাভীর সৎকার করার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে। গাভী কোনো সংক্রামক রোগে মারা গেলে তার সৎকার প্রয়োজন। মৃত গাভীর শবদেহ মাটির ০.৫ মিটার নিচে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে এবং উপরিভাগে চুন বা ডি.ডি.টি. (D.D.T.) ছড়িয়ে শোধন করতে হবে। আর অসুস্থ গাভীগুলোকে আলাদা কক্ষে রাখা উচিত, বিশেষ করে অসুখটি যদি কোনো সংক্রামক ব্যাধি হয়। ছোঁয়াচে গর্ভপাত বা ব্রুসেলোসিস রোগ হলে তা স্বাস্থ্যসম্মত বিধিব্যবস্থা দিয়েই নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। ছোঁয়াচে গর্ভপাত গাভীর একটি মারাত্মক ব্যাধি। স্যাঁতস্যাঁতে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এই রোগের বিস্তার ঘটে। এই রোগের উৎস সব সময়ই কোনো না কোনো প্রসূতি গাভী। প্রস্তুতি কক্ষে কোনো গাভী থাকাকালীন ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত অন্য সুস্থ গাভীর সংশ্রবে আনা যাবে না। একাধিক গাভী প্রসূতি হলে ঘরের মধ্যে বেড়া দিয়ে আলাদা করে রাখতে হবে। বাচ্চা প্রসবের পরে প্রসূতি কক্ষগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে শোধন করতে হবে। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো ওষুধ দেয়া যেতে পারে।

৬. নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা

কৃমির ডিম যত্রতত্র বেঁচে থাকার জন্য বাংলাদেশের জলবায়ু বিশেষ উপযোগী। বিভিন্ন ধরনের মাছি, মশা, উকুন, আটালি, অন্যান্য কীটপতঙ্গ ও শামুক কৃমিসহ বেশ কিছু রোগের বাহক। এরা নিজেরাই আবার পরজীবী হিসেবে গাভীর দেহে আশ্রয় নিয়ে বেশ কিছু রোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং বহিঃ ও অন্তঃ উভয় পরজীবীর বিরুদ্ধেই কৃমিনাশক ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়, বিশেষ করে যকৃৎ ও অন্ননালীর কৃমির জন্য তো বটেই। এছাড়াও রয়েছে কতগুলো এককোষী পরজীবী। বিভিন্ন প্রজাতির কৃমির বিরুদ্ধে কাজ করে এমন কৃমিনাশক ওষুধ নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো নিয়মিত ব্যবহার করে গাভীর কৃমি দমন করা যায়।

৭. সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা

গাভীর সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে খুরা রোগ (foot and mouth disease), তড়কা (anthrax), বাদলা (black quarter), গলাফোলা (haemorrhagic septicaenia), সংক্রামক গর্ভপাত (brucellosis), জলাতঙ্ক (rabies) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ম্যাস্টাইটিস (mastitis) বা ওলানপ্রদাহ দুগ্ধবতী গাভীর একটি অতি সাধারণ রোগ। উপরোক্ত রোগগুলোর প্রতিষেধক বা টিকা সরকারীভাবে এদেশে তৈরি হয় এবং তা বিভিন্ন পশু হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারিতে সরবরাহ করা হয়। কাজেই নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো গাভীকে নিয়মিত এসব সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া পশু রোগ নিবারণের সর্বোত্তম পন্থা। অবশ্য ওলানপ্রদাহের কোনো প্রতিষেধক টিকা নেই। এজন্য ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো চিকিৎসা করাই উত্তম।

নিম্নে দুগ্ধবতী গাভীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৭.২.১ ঃ গাভীর বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকার নাম, ব্যবহার মাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি ও সময়

নাম	ব্যবহার মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি	সময়
তড়কা রোগের টিকা	১ মি.লি.	গলার ঢিলা চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে	বছরে একবার টিকা প্রয়োগ করা হয়
বাদলা রোগের টিকা	৫ মি.লি.	গলার ঢিলা চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে	৬ মাস অন্তর টিকা দিতে হবে

খুরা রোগের টিকা	ট্রাইভ্যালেন্ট- ৯ মি.লি. ডাইভ্যালেন্ট- ৬ মি.লি. মনোভ্যালেন্ট- ৩ মি.লি.	গলাকম্বলের ত্বকের নিচে ইনজেকশন দিতে হবে	৪-৬ মাস পরপর টিকা দিতে হবে
গলাফোলা রোগের টিকা	২ মি.লি.	গলার ঢিলা চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে	বছরে একবার টিকা দিতে হবে
রিন্ডারপেস্ট রোগের টিকা	১ মি.লি.	চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে	একবার প্রয়োগ করলে কয়েক বছর পর্যন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে দুগ্ধবতী গাভীর স্বাস্থ্য সম্মত লালন পালন ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবে।

সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বলতে এমন কতগুলো স্বাস্থ্যগত বিধিব্যবস্থাকে বোঝায় যা এযাবৎকাল সারা পৃথিবীতে প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এগুলো হলো– বাসস্থান নির্মাণে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা ও দুর্যোগ নিবারণ করা, খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রজনন ও প্রসবে জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা, মলমূত্র নিষ্কাশন করা, অসুস্থ গাভী পৃথকীকরণ ও মৃত গাভীর সৎকার করা, নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করা ইত্যাদি। গাভীর বিভিন্ন রোগ দমনের জন্য ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শমতো সময়ে টিকা প্রদান ও কৃমিনাশক ব্যবহার করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গাভীর মৃতদেহ মাটির কত গভীরে পুঁততে হবে?

ক) ১.০ মিটার খ) ০.৭৫ মিটার

গ) ০.২৫ মিটার ঘ) ০.৫ মিটার

২। বাংলাদেশে খুরা রোগের কী কী টিকা আছে?

ক) মনোভ্যালেন্ট ও ডাইভ্যালেন্ট খ) মনোভ্যালেন্ট, ডাইভ্যালেন্ট ও ট্রাইভ্যালেন্ট

গ) ডাইভ্যালেন্ট ও ট্রাইভ্যালেন্ট ঘ) ডাইভ্যালেন্ট ও টেট্রাভ্যালেন্ট

পাঠ-৭.৩ দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- দুধ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

স্বাস্থ্যবতী গাভীর বাচ্চা প্রসবের ১৫ দিন পূর্বে এবং বাচ্চা প্রসবের ৫ দিন পরে গাভীর ওলান হতে নিঃসৃত কলস্ট্রাম মুক্ত যে তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাকে দুধ বলে। দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। এটি শিশু, নারী, বৃদ্ধসহ সকল বয়সের নারী পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। দুধের পুষ্টিগতমান অনেক বেশি। দুধ দেহের মাংসপেশি গঠনে, হাঁড় তৈরিতে এবং শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। দুধ শিশুদের মস্তিষ্ক বিকাশে সাহায্য করে। দুধে এমন কতগুলো খাদ্যপ্রাণ আছে যা অন্য কোনো খাদ্যে পাওয়া যায়না।

দুধে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন এ, ডি, এবং রাইবোফ্ল্যাভিন আছে যা শিশুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে এবং দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে। দুধ মৃদু মিষ্ট ও অতি সামান্য লবনাক্ত। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ খাদ্য হিসাবে দুধের গুরত্ব অপরিসীম। শিশুর বৃদ্ধি, যুবকের শক্তি, বৃদ্ধের জীবনধারন এবং অসুস্থ ব্যক্তির পথ্যের ক্ষেত্রে দুধের ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্য।

দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ

দুধ আদর্শ খাদ্য হওয়ায় এ থেকে উৎপাদিত খাদ্য দ্রব্য বেশ পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু হয়ে থাকে। দুধ একটি পচনশীল এবং কাঁচা দ্রব্য হওয়ায় এর সংরক্ষণকাল অল্প হয়ে থাকে। অনেক দেশের মত আমাদের দেশেও দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারগুলোর অবস্থান গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হয়ে থাকে। অনেক সময় দুধের উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় অর্থ্যৎ সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ভোক্তা কর্তৃক দুগ্ধজাত দ্রব্য পছন্দনীয় হওয়ায় দুধ প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজন হয়।

দুগ্ধখামারে কাঁচা দুধ উৎপাদন হওয়ার পর দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কারখানায় বিভিন্ন ধরণের দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরী করার জন্য পাঠানো হয়। গবাদি প্রাণীর দুধ থেকে প্রক্রিয়াজাতকৃত দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলো হচ্ছে:

টক দই বা মিষ্টি দই, ঘি, মাখন, চীজ বা পনির, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি যেমন- রসগোল্লা, কাঁচা গোল্লা, চমচম, সন্দেশ, মন্ডা, ছানা, মালাইকারী; গুঁড়োদুধ, পুডিং, পায়েশ, ক্রিম, আইসক্রিম, আইসমিল্ক, হুয়ে, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি।

দুগ্ধ সংরক্ষণ

সুস্থ সবল গাভীর ওলানের দুধে সামান্য কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে। দুধ সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ করার মধ্যবর্তী সময়ে দুধে জীবাণুর পরিমাণ বাড়ে, এই সব জীবাণুর পরিমাণ দুধ দোহন পদ্ধতি ও দুধ পরিবহনের মানের উপরে নির্ভর করে । ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির হার ও দুধের পচনের উপর দুধের তাপমাত্রার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাধারনত: বলা যায় যে, যদি দুধ ঠান্ডা/শীতল না করা হয় ও দুধ দোহনের পরবর্তী ৫ ঘন্টার মধ্যেও সংরক্ষণ করা না হয়, তবে সেই দুধ আর প্রক্রিয়াজাত করার উপযোগী থাকে না। বাংলাদেশের এমন অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে বিশুদ্ধ/টাটকা দুধ শীতলীকরন কষ্টদায়ক। দুধ দোহনের পর প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পৌছানোর মধ্যবর্তী সময়টা খুবই সংকটাপূর্ণ কারন এই সময়ের মধ্যে দুধের পচন শুরু হয় ও গুনগতমান অধিকতর মন্দ হতে থাকে। বাংলাদেশে বেশিরভাগ দুধই উৎপাদন হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী/কৃষক দ্বারা এবং এই অল্প পরিমানের দুধ সংগ্রহ ও বিলি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং কঠিন। এখানে কৃষক দুধ একটি নির্দিষ্ট সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দেয় যেখানে দুধ পরিমাপ ও রেকর্ড গ্রহন করা হয় এবং মাঝে মধ্যে দুধ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এর গুনগতমান যাচাই করা হয়। এই সমস্ত দুধ পরবর্তীতে শীতলীকরণ হয়। পরে এই সংগ্রহীকৃত শীতলীকৃত দুধ ট্রাকের মাধ্যমে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পাঠানো হয়। এই ভাবে দুধ সংগ্রহ থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে পৌছাতে সময় লাগে পাঁচ ঘন্টারও বেশি, ফলে দুধের গুনগতমানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং প্রায়ই প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে এই সমস্ত দুধ প্রত্যাখান করে এবং এই সমস্ত দুধ ভোক্তাদের কাছেও গ্রহন যোগ্য হয় না। ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি কমানোর জন্য শীতলীকরন সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি। শীতলীকরন পদ্ধতিতে দুধের গুনগত মান বজায় থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই

পদ্ধতিটি খুবই ব্যয়বহুল ও সংবেদনশীল আবার কোন কোন দেশে এটি অসম্ভব পদ্ধতি। যেখানে শীতলীকরন পদ্ধতি সম্ভপর নয় সেখানে কিছু বিকল্প পদ্ধতির ব্যবহার করা খুবই জরুরি।

দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতিসমূহ

দুধ সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক) সনাতন পদ্ধতি: সনাতন পদ্ধতিতে নিম্নলিখিতভাবে দুধ সংরক্ষণ করা যায়। যথা:

১. **মাটির কলসির ব্যবহার:** মাটির কলসিতে করে দুধ রাখালে দুধের তাপমাত্রা প্রকৃতির তাপমাত্রার তুলনায় তুলনামূলক ভাবে অনেক কম থাকে ফলে গুনগত মানও অক্ষুন্ন থাকে। মাটির কলসিতে দুধ রাখলে কয়েক ঘন্টা সংরক্ষণ করা যায়।

২. **টিউবয়েলের নিকট মাটি চাপা দিয়ে:** কোন মুখবন্ধ পাত্রে দুধ নিয়ে সেটি যদি টিউবয়েলের নিকট ভেজা মাটি দিয়ে চাপা দেয়া হয় তবে দুধের তাপমাত্রা অনেক কম থাকে ও দুধ প্রায় কয়েকঘন্টা ভাল থাকে।

৩. **কলাপাতা ও খেঁজুরের পাতার ব্যবহার:** দুধ দোহনের পর কলাপাতা ও খেঁজুরের পাতা দিয়ে রাখলে পাতার সাদা সাদা চুনের মত পদার্থ দুধের অম্লত্ব কমায় কারন এগুলো ক্ষারীয় পদার্থ ফলে দুধের সংরক্ষনকাল স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়।

৪. **তাপ দিয়ে ফুটিয়ে:** তাপ দিয়ে ফুটিয়ে দুধ সংরক্ষণ করা হয়। পারিবারিকভাবে এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। একবার গরম করলে দুধ সাধারণত ৪ ঘন্টা ভালো থাকে। সে কারণে ৪ ঘন্টা পরপর ২০ মিনিট দুধ গরম করলে প্রায় সব রকমের জীবাণু ধ্বংস হয়। তবে এতে দুধের পুষ্টিমান কিছুটা কমে যায়। কারণ উচ্চ তাপে কিছু ভিটামিন ও অ্যামইনো অ্যাসিড নষ্ট হয়ে যায়।

৫. **ল্যাকটো পারঅক্সিডেজ পদ্ধতি:** ল্যাকটো পারঅক্সিডেজ দুধের একটি আমিষ যেটি স্বাভাবিক ভাবেই দুধের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ল্যাকটো পারঅক্সিডেজ সক্রিয়করন পদ্ধতিটি থায়ো সায়ানেট (১৫ পিপিএম) ও হাইড্রোজেন পারঅক্সিডেজ (৮.৫ পিপিএম) দুধের মধ্যে যুক্ত করার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। ফিজ্রের দুধে এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে ব্যাকটেরিয়া বিরোধী প্রভাব দুধে পাঁচ থেকে ছয় দিন বিদ্যমান থাকে এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রায় দুধের স্থায়ীত্বকাল বেড়ে সাত থেকে আট ঘন্টা হয়।

খ) আধুনিক পদ্ধতি: আধুনিক পদ্ধতিতে নিম্নলিখিতভাবে দুধ সংরক্ষণ করা যায়। যথা:

১. **রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ:** রেফ্রিজারেটরে ৪°C তাপমাত্রায় রেখে স্বল্প সময়ের জন্য দুধ সংরক্ষণ করা যায়।

২. **ফ্রিজারে সংরক্ষণ:** ফ্রিজার বা ডিপ ফ্রিজে দুধ সংরক্ষণ করা যায়। ডিপ ফ্রিজে রাখলে দুধে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় না ঠিকই কিন্তু এতে দুধের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙ্গে যায়। ফলে দুধের গুণগত মান কিছুটা হ্রাস পায়।

৩. **দুধ পাস্তুরিকরণ:** দুধ অন্যতম আদর্শ খাদ্য। এটি যেমন বাছুর ও মানুষের কাছে আদর্শ খাবার, তেমনি অণুজীবের বংশবিস্তারের জন্যও সমানভাবে আদর্শ মাধ্যম। দোহনের পর সময়ের সাথে দুধের গুণাগুণ নষ্ট হতে শুরু করে। আর দীর্ঘক্ষণ সাধারণ তাপমাত্রায় রাখলে এক সময় দুধ সম্পর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য মূলত বিভিন্ন প্রজাতির অণুজীব বা জীবাণুই দায়ী। এই অণুজীব অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ও নিম্নমাত্রায় জন্মাতে ও বংশ বিস্তার করতে পারে না। কাজেই দুধকে দীর্ঘ সময়ের জন্য জীবাণুমুক্ত রাখতে নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় তাপ দেয়া হয়। এতে একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রজাতির রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস হয়, অন্যদিকে তেমনি দুধে উপস্থিত কিছু অনুঘটক বা এনজাইম নিস্ক্রিয় হয়। ফলে দুধ দীর্ঘ সময় খাবার উপযোগী থাকে। দোহনের পর দুধকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করাকে পাস্তুরিকরণ বলে। এতে দুধে উপস্থিত সকল রোগজীবাণু ও অনুঘটক নষ্ট হয়ে যায়। এই দুধকে পাস্তুরিত দুধ বলে। এই পাস্তুরিত দুধ সঙ্গে সঙ্গেই ৪°C তাপমাত্রার নীচে নামিয়ে আনতে হয়। লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) নামে এক ফরাসি বিজ্ঞানী এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন বিধান তার নামানুসারের পদ্ধতিটির নাম পাস্তুরিকরণ (Pasteurization) রাখা হয়েছে।

পাস্তুরিকরণের তাপমাত্রা ও সময়ের ওপর নির্ভর করে পাস্তুরিকরণকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যেমন:

নিম্ন তাপ দীর্ঘ সময় পাস্তুরিকরণ: এতে দধু কে ৬২.৮°C তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট ধরে উত্তপ্ত করা হয়।

উচ্চ তাপ কম সময় পাস্তুরিকরণ: এতে দধু কে ৭২.২°C তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড ধরে উত্তপ্ত করা হয়।

অতি উচ্চ তাপ অতি কম সময় পাস্তুরিকরণ: এতে দুধকে ১৩৭.৮°C তাপমাত্রায় মাত্র ২ সেকেন্ডের জন্য উত্তপ্ত করা হয়। নিম্নে পাস্তুরিকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করা হলো:-

পাস্তুরিকরণের সুবিধা

- ✓ পাস্তুরিকৃত দুধ নিরাপদ, কারণ এতে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ধ্বংস হয়।
- ✓ পাস্তুরিকরণ দুধের সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করে, কারণ এই প্রক্রিয়ার ফলে দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রস্তুতকারী জীবাণুর সংখ্যা কমে যায়।
- ✓ দুধের অনুঘটক নষ্ট হয়ে যায়। ফলে দুধ দীর্ঘ সময় ভালো ও খাওয়ার উপযোগী থাকে।
- ✓ দুধে উপস্থিত অধিকাংশ রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।
- ✓ এই প্রক্রিয়ায় দুধের স্বাদ ও পুষ্টিমান ঠিক থাকে।

পাস্তুরিকরণের অসুবিধা

এই প্রক্রিয়াটি আদর্শ উপায়ে করতে না পারলে অতিরিক্ত আলোচ্ছলে দুধের চর্বিকণাগুলো আলাদা হয়ে যেতে পারে। এতে তাপ সংবেদনশীল ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উচ্চ তাপে কিছুটা স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে দুধ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং পদ্ধতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবে।

সারসংক্ষেপ

দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। দুধ দেহের মাংসপেশি গঠনে, হাঁড় তৈরিতে এবং শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। দুধ শিশুদের মস্তিষ্ক বিকাশে সাহায্য করে। দুধে এমন কতগুলো খাদ্যপ্রাণ আছে যা অন্য কোনো খাদ্যে পাওয়া যায় না। শিশুর বৃদ্ধি, যুবকের শক্তি, বৃদ্ধের জীবনধারন এবং অসুস্থ ব্যক্তির পথ্যের ক্ষেত্রে দুধের ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্য। দুধ সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো হলো - সনাতন পদ্ধতি এবং আধুনিক পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি দুগ্ধজাত দ্রব্য নয়?

ক) কবুতর খ) কোয়েল
গ) কাটলেট ঘ) ঘুঘু

২। নিচের কোন্‌টি দুধ পাস্তুরিকরণের ক্ষেত্রে সত্য নয়?

ক) নিম্ন তাপ দীর্ঘ সময় খ) অতি নিম্ন তাপ অতি দীর্ঘ সময়
গ) উচ্চ তাপ কম সময় ঘ) অতি উচ্চ তাপ অতি কম সময়

পাঠ-৭.৪ মহিষ পালন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহিষের বাসস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মহিষের খাদ্য সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মহিষের পরিচর্যা কীভাবে করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

পৃথিবীতে **বিভিন্ন** জাতের মহিষ **রয়েছে**। একেক জাতের বৈশিষ্ট্যাবলী একেক রকম। কোনো কোনো জাত অধিক ও ভালোমানের দুধ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। কোনো কোনো জাত মাংস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। আবার কোনো কোনো জাত মাংস ও দুধ উভয়ই উৎপাদন করে থাকে। এছাড়াও কোনো কোনো জাত শক্তি উৎপন্ন করে থাকে। গৃহপালিত মহিষের বিভিন্ন জাতগুলোকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- নদী ও জলাভূমির মহিষ। নদীর মহিষের মধ্যে মুররা, নীলি, রাভি, জাফরাবাদি ইত্যাদি বিখ্যাত। এরা প্রধানত দুধ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। জলাভূমির মহিষ প্রধানত শক্তি ও মাংস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। বাংলাদেশে মহিষের উল্লেখযোগ্য কোনো জাত নেই। বাংলাদেশের মহিষকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- নদী, জলাভূমি এবং নদী ও জলাভূমির মহিষের সংকর। দেশের উপকূলীয়, হাওর এবং আখ উৎপাদনকারী এলাকাসমূহে মহিষের বিস্তৃতি তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। এই অংশ টুকু Moina Font এ করা হাতে লিখে দিলে কম্পোজ করে দেবো।

মহিষের বাসস্থান

গরু, ছাগল এবং অন্যান্য গবাদি প্রাণির ন্যায় মহিষেরও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের প্রয়োজন। যদিও গ্রামে-গঞ্জে দুচারটা মহিষ পালনের ক্ষেত্রে বাসস্থান বা ঘরের ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। তথাপি, খামারভিত্তিতে একসঙ্গে অনেক মহিষ পালন করতে হলে ঘর তৈরির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। এদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, হাওড় এলাকা ও আঁখ উৎপাদনকারী এলাকায় অনেকেই ৪০/৫০ থেকে ১০০ বা ততোধিক মহিষ পালন করে থাকেন। এদের জন্য বাসস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহিষের ঘর গরুর অনুরূপভাবেই তৈরি করা যায়। তবে, ঘর তৈরিতে মজবুত অথচ সস্তা জিনিসপত্রই ব্যবহার করা উচিত। মহিষের ঘর তৈরিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন-

- ✓ ঘর স্বাস্থ্যসম্মত ও আরামপ্রদ হবে।
- ✓ এতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকবে।
- ✓ মেঝে মজবুত হবে ও তাতে পিচ্ছিলভাব থাকবে না।
- ✓ ঘরে প্রতিটি মহিষের জন্য বয়স অনুপাতে প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা থাকবে।
- ✓ উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে।

একমাস বয়সি একটি বাছুরের জন্য ১.০ মিটার # ১.৫ মিটার জায়গার প্রয়োজন হয়। গ্রামাঞ্চলে বকনা মহিষ অন্যান্য মহিষের সঙ্গে একই ঘরে বা গোয়ালে রাখা হয়। তবে সাধারণত প্রতিটি অগর্ভবতী বকনা মহিষের জন্য ৫-৬ বর্গ মিটার উদোম/ছাদবিহীন স্থান; ১.০-১.৫ বর্গ মিটার ছাদযুক্ত স্থান ও ৪০-৫০ সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট চাড়ি প্রয়োজন। প্রতিটি গর্ভবতী বকনার জন্য ৮-১০ বর্গ মিটার উদোম/ছাদবিহীন স্থান; ৩-৪ বর্গ মিটার ছাদযুক্ত স্থান ও ৫০-৭৫ সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট চাড়ি প্রয়োজন। অনুরূপভাবে একটি পূর্ণবয়স্ক ষাঁড় মহিষের জন্য ১০-১২ বর্গ মিটার আয়তনবিশিষ্ট ছাদযুক্ত ঘরের প্রয়োজন।

মহিষের খাদ্য

মহিষের দেহরক্ষা, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি, তাপ সংরক্ষণ ও পেশির শক্তি উৎপাদন, দুধ উৎপাদন এবং বংশবৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মহিষ থেকে পর্যাপ্ত দুধ, মাংস, শক্তি ইত্যাদি পেতে হলে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় এদেরকেও পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য প্রদান করতে হবে। মহিষ পালনের অন্যতম সুবিধা হলো এরা গরুর তুলনায় অতি নিম্নমানের খাদ্য খেয়েও সহজে হজম করতে পারে এবং তুলনামলকভাবে বেশি উৎপাদন দিয়ে থাকে। এদেশের বেশির ভাগ মহিষই রাস্তার পাশের ঘাস, ধানের খড় এবং কোনো কোনো সময় সামান্য খৈল বা ভুশি খেয়ে জীবনধারণ করে। মহিষের খাদ্যকে প্রধানত: তিনভাগে

ভাগ করা যায়। যেমন– ক. আঁশযুক্ত খাদ্য, খ. দানাদার খাদ্য ও গ. খাদ্য অনুসঙ্গ বা অ্যাডিটিভস্। শুষ্ক আঁশযুক্ত খাদ্যসমূহ, যেমন- বিভিন্ন শস্যের খড় এবং তাজা ঘাস, যেমন- নেপিয়ার, প্যারা, জোয়ার প্রভৃতি মহিষের খাদ্যের প্রধান উৎস। দানাদার খাদ্যের মধ্যে চালের কুঁড়া, গমের ভুশি, ভুট্টা, যব, চাল, বিভিন্ন ধরনের খৈল, যেমন- সরিষা, তিসি, তিল, বাদাম ইত্যাদির খৈল এবং বিভিন্ন ধরনের লিগিউমের বীজ, যেমন- বুট, মটর, কলাই, খেসারি ইত্যাদি প্রধান। এছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে তৈরি বিভিন্ন ধরনের ফিড অ্যাডিটিভস বাজারে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন বয়সের মহিষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- ✓ ৩-৬ মাস পর্যন্ত বকনা মহিষের জন্য– দৈনিক ১০-১২ কেজি সবুজ যব/ভুট্টা/সংরক্ষিত সবুজ ঘাস ও ১.২-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য অথবা ৩ কেজি সবুজ ঘাস, ২ কেজি খড় ও ১.৪-২.০ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- ✓ ৬-১২ মাস বয়সের বকনার জন্য– দৈনিক ২০-২৫ কেজি সবুজ যব/ভুট্টা ও ১.২৫ কেজি দানাদার খাদ্য অথবা ৫ কেজি সবুজ ঘাস, ৩ কেজি খড় ও ২ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- ✓ ১ বছর থেকে গর্ভধারণের সময় পর্যন্ত বকনার খাদ্যতালিকা– দৈনিক ৩০-৩৫ কেজি সবুজ যব/ভুট্টা ও ২ কেজি দানাদার খাদ্য অথবা ৩০ কেজি খেসারি/কাউপি, ৩ কেজি খড় ও ১ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- ✓ দুগ্ধবতী মহিষের জন্য- একটি ৫০০ কেজি ওজনের মহিষের খাদ্যে দৈনিক ৬০ কেজি সবুজ বারসিম ও ৫.৫ কেজি গমের খড় বা ২০ কেজি সুবজ যব/ভুট্টা, ৫ কেজি গমের খড় ও ৪ কেজি দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ থাকতে হবে।
- ✓ ষাঁড়ের জন্য- একটি ৬০০ কেজি ওজনের ষাঁড়ের জন্য দৈনিক ৪০-৫০ কেজি সবুজ ঘাস ও ২-৩ কেজি খড় এবং ২.০-৩.০ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।

মহিষের পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন ব্যবস্থা

মহিষকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখা এবং এদের থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পেতে হলে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও যত্ন বা পরিচর্যার প্রয়োজন। তাছাড়া এদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে লালনপালন করতে হবে। পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন বলতে সময়মতো খাবার পরিবেশন করা, গর্ভবতী মহিষের যত্ন, বিভিন্ন বয়সের মহিষের পরিচর্যা, অসুস্থদের চিকিৎসা করানো, সুস্থগুলোকে সময়মতো টিকা প্রদান, কৃমির ওষুধ খাওয়ানো, ঘর ও আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করা ইত্যাদি বোঝায়। সব বয়সের মহিষের জন্যই কিছু কিছু সাধারণ পরিচর্যা রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন বয়স ও অবস্থাভেদে বিশেষ ধরনের পরিচর্যারও প্রয়োজন হয়।

মহিষ পালনের সাধারণ পরিচর্যাসমূহ নিম্নরূপ-

- মহিষ মূলতঃ আধা-পানির (semi-aquatic) নিশাচর প্রাণী। তাই পানির প্রতি এদের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। মহিষের দেহে প্রয়োজনের তুলনায় ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা খুবই কম। তাই নদীর মহিষ পরিষ্কার পানি এবং জলাশয়ের মহিষ ডোবা-নালার কর্দমাক্ত পানি গায়ে মেখে দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে। একারণে যেখানে ডোবা-নালা নেই সেখানে ছায়াযুক্ত স্থানে পাইপের সাহায্যে দিনে অন্তত দুবার মহিষের গায়ে পানি ছিটানো প্রয়োজন।
- প্রতিদিন এদের ঘর পরিষ্কার করতে হবে। গোবর, চনা আলাদা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। সপ্তাহে অন্তত একবার জীবাণুনাশক ওষুধ (যেমন- আয়োসান) দিয়ে ঘর জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- এদের গা ভালোভাবে ডলে দিতে হবে এবং নিয়মিত গোসলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মহিষের সংখ্যা বেশি হলে চিহ্নিত করার জন্য কানে ট্যাগ নম্বর লাগাতে হবে।
- প্রয়োজনে, বিশেষ করে ভারবাহী মহিষের ক্ষেত্রে, পায়ে লোহার তৈরি সু বা জুতো লাগাতে হবে।
- নিয়মিত সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তাছাড়া পরিষ্কার পানিরও ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে দুগ্ধবতী গাভীর দুধ দোহন করতে হবে। দুধ দোহনের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- ঘরের কোনো মহিষ অসুস্থ হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে পৃথক করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল বয়সের মহিষকে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে ও টিকা প্রদান করতে হবে। মহিষকে নিয়মিত জীবাণুঘটিত, পরজীবীঘটিত, অপুষ্টিজনিত, বিপাকীয় ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করাতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে মহিষের পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসম্মত লালনপালন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবে।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের মহিষ রয়েছে। একেক জাতের বৈশিষ্ট্যাবলী একেক রকম। মহিষের প্রধান দু'টি ভাগ হচ্ছে - নদী ও জলাভূমির মহিষ। বাংলাদেশে মহিষের উল্লেখযোগ্য কোনো জাত নেই। বাংলাদেশের মহিষকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- নদী, জলাভূমি এবং নদী ও জলাভূমির মহিষের সংকর। দেশের উপকূলীয়, হাওর এবং আখ উৎপাদনকারী এলাকাসমূহে মহিষের বিস্তৃতি তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। এই অংশ টুকু Moina Font এ করা হাতে লিখে দিলে কম্পোজ করে দেবো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মহিষের খাদ্যকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) ৩ ভাগে খ) ৫ ভাগে

গ) ৬ ভাগে ঘ) ৪ ভাগে

২। কোনটি আঁশ জাতীয় খাদ্য নয়?

ক) খড় খ) সাইলেজ

গ) হে ঘ) ভূট্টার দানা

পাঠ-৭.৫ ছাগল পালন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ছাগল পালনের সুবিধাদিসমূহ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- ছাগলের বাসস্থান ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ছাগলের পরিচর্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিভক্ত খুরবিশিষ্ট (Cloven hoofed) রোমন্থক (ruminant) প্রাণীদের মধ্যে ছাগল ও ভেড়া প্রথম গৃহপালিত পশু। প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে প্রথমে বুনো ভেড়া ও পরে বুনো ছাগলকে পোষ মানানো হয়েছিল। এরা অত্যন্ত উপকারী প্রাণী। এদের দুধ ও মাংস অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। চামড়া, লোম/পশম ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্য বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়। ছাগল পালন অত্যন্ত সহজ। এরা আকারে ছোট, তাই জায়গা কম লাগে। এদের রোগব্যাধি গরুর তুলনায় অনেক কম। এরা অত্যন্ত উৎপাদনশীল; একটি স্ত্রী ছাগল বা ছাগী থেকে বছরে অন্তত চারটি বাচ্চা পাওয়া যায়। তাই ছাগল পালন করে সহজেই লাভবান হওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রধানত 'ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট (Black Bengal goat)' বা 'বাংলার ছাগল' জাতটিই বেশি পাওয়া যায়। এদেশের ৯৮% ছাগলই গ্রামে পারিবারিকভাবে পালন করা হয়। বেশির ভাগ পালনকারী ভূমিহীন কৃষক। যাদের পক্ষে গাভী কেনা সম্ভব নয়, তারা সহজেই ছাগল কিনে পালন করতে পারেন। ছাগলকে তাই 'গরীবের গাভী' বলা হয়। এদেশের অসংখ্য বেকার ও ভূমিহীন লোক এবং দুঃস্থ মহিলারা ছাগল পালনের মাধ্যমে সহজেই আত্মকর্মসংস্থান করতে পারেন।

ছাগল পালনে সুবিধাদি

- ছাগল দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। এরা ৬/৭ মাস বয়সেই প্রজননের (breeding) উপযোগী হয়। ছাগী গর্ভবতী হওয়ার প্রায় পাঁচ মাস পরেই বাচ্চা প্রসব করে এবং প্রতিবারে অন্তত ২/৩টি বাচ্চা দেয়। কাজেই একটি ছাগী থেকে বছরে অন্তত চারটি বাচ্চা পাওয়া যায়।
- ছাগল ছোট প্রাণী; তাই এদের জন্য জায়গা কম লাগে। এরা নিরীহ বলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পালন করতে পারে। ছাগল পালনে পুঁজি কম লাগে। এটি ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষিদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস।
- যে পরিবেশ বা আবহাওয়ায় গরু মহিষ জীবনধারণ করতে পারে না ছাগল সেখানে সহজেই খাপ খাইয়ে নেয়।
- গরু মহিষের তুলনায় এদের জন্য খাদ্য কম লাগে। কারণ, ছাগল খাদ্য রূপান্তরে (feed conversion) গরুর থেকে বেশি দক্ষ। এরা বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা, ঘাস, লতা খেয়ে সহজেই জীবনধারণ করতে পারে।
- গরুর তুলনায় ছাগল রোগব্যাধিতে কম আক্রান্ত হয়।
- ছাগলের দুধের চর্বির কণিকাগুলো (fat globules) অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় গরুর দুধের তুলনায় সহজে হজম হয়। তাই বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য এই দুধ অধিক উপযোগী, উপাদেয় এবং উৎকৃষ্ট। ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এগুলো মোলায়েম ও নরম আঁশযুক্ত, তাই সহজে হজম হয়। খাসির মাংস সকল ধর্মের লোকের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। এদেশে ছাগলের মাংসের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি বলে বাণিজ্যিকভাবে অধিক লাভজনক।
- বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার গুণগতমান অতি উন্নত, তাই বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক চাহিদা। এই চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

ছাগলের বাসস্থান

অন্যান্য প্রাণীদের মতো ছাগলেরও রাত্রি যাপন, নিরাপত্তা, ঝড়বৃষ্টি, ঠান্ডা, রোদ ইত্যাদির কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন রয়েছে। তবে, এদেশের গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক পর্যায়ে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে বাসস্থানের জন্য তেমন কোনো আলাদা ব্যবস্থা দেখা যায় না। গোয়াল ঘর বা গোশালায় গরু মহিষের পাশাপাশি, ঘরের বারান্দা, রান্নাঘর প্রভৃতি

স্থানে ছাগলের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে জায়গা স্বল্পতার জন্য ও নিরাপত্তার কারণে নিজেদের ঘরের ভেতরেই ছাগলের রাত যাপনের ব্যবস্থা করেন। রোগমুক্ত আবহাওয়ায় কেউ কেউ রাতের বেলা এদেরকে নিজেদের ঘরের পাশে গাছের নিচেই বেধে রাখেন। দু'চারটি ছাগল পালনের ক্ষেত্রে এসব ব্যবস্থায় তেমন কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু, একসঙ্গে অনেক ছাগল পালন করতে হলে অর্থাৎ খামারে ছাগল পালন করতে হলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ছাগলের বাসস্থান বা ঘর তৈরি করতে হবে।

ছাগলের ঘরের ধরন

ছাগল পালনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঘর রয়েছে। তবে, এদেশে নিম্নে উল্লেখিত দু'ধরনের ঘরই বেশি দেখা যায়। যেমন- ১. ভূমির উপর স্থাপিত ঘর ও ২. খুঁটির উপর স্থাপিত ঘর।

১. **ভূমির উপর স্থাপিত ঘর ঃ** এই ধরনের ঘরেই গ্রামের সাধারণ গৃহস্থরা ছাগল পালন করে থাকেন। এই ধরনের ঘরের মেঝে কাঁচা অর্থাৎ মাটি দিয়ে, আধা পাকা অর্থাৎ শুধু ইট বিছিয়ে অথবা সিমেন্ট দিয়ে পাকা করে তৈরি করা যায়। এই ধরনের ঘরের মেঝেতে শুকনো খড় বিছিয়ে দিলে ভালো হয়। তবে, ঘর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২. **খুঁটির উপর স্থাপিত ঘর ঃ** এই ধরনের ঘর সাধারণত মাটি থেকে ১.০-১.৫ মিটার অর্থাৎ ৩.৩-৪.৯ ফুট উচ্চতায় খুঁটির উপর তৈরি করা হয়। এজাতীয় ঘর ছাগলকে মাটির স্যাঁতস্যাঁতে ভাব, বন্যার পানি, নালা-নর্দমা থেকে চোয়ানো পানি প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে। এজাতীয় ঘরের মেঝে বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে মাঁচার মতো করে তৈরি করা হয়। ছাগল পালনে এই ধরনের ঘর অত্যন্ত সুবিধাজনক। তাছাড়া স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। কারণ, এই ধরনের ঘর পরিষ্কার করা সহজ এবং ছাগলের গোবর ও চনা সংগ্রহ করাও সহজ। মেঝের ফাঁক দিয়ে গোবর ও চনা নিচে পড়ে যায় বলে খাদ্য ও পানি দুষিত হয় না এবং রোগজীবাণু ও কৃমির আক্রমণও কম হয়। দু'ধরনের ঘরই একচালা, দোচালা বা চৌচালা হতে পারে এবং ছাগলের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে তা ছোট বা বড় হতে পারে।

চিত্র ৭.৫.১ : খুটির উপর স্থাপিত ঘর

ছাগলের খাদ্যাভ্যাস

ছাগল অনুসন্ধিৎসু প্রাণী। খাদ্যের সন্ধানে এরা বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে। এই ধরনের খাদ্যাভ্যাস এদের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বেশ সহায়তা করে। এরা অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে পারে। প্রচন্ড খরার মধ্যেও অনেকক্ষণ পানি ছাড়া থাকতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা খাদ্য ঘাটতির সময় অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে যা সচরাচর অন্যান্য গৃহপালিত পশু খায় না। তৃণভোজী পশুদের মধ্যে ছাগলের মুখ অত্যধিক শক্ত। এরা এদের সচল উপরের ঠোঁট (mobile upper lip) ও পরিগ্রাহী জিহ্বার (prehensile tongue) সাহায্যে অনায়াসে ছোট ছোট ঘাস, বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা,

সুরক্ষিত কাঁটা ঝোপ, গাছের শাখাপ্রশাখা ইত্যাদি টেনে ছিড়ে খেতে পারে। এরা যা খায় তা একেবারে মুড়ে খায়। ছাগল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে খাদ্যসামগ্রীকে পরিপূর্ণভাবে উৎপাদন সামগ্রীতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

ছাগল নানা ধরনের খাদ্যবস্তু খেতে পছন্দ করলেও সব সময় একই ধরনের খাবার খেতে চায় না। তাই এদের খাদ্যে বৈচিত্র থাকা উচিত। কোনো একটি ছাগলের উচ্ছিষ্ট খাদ্য সাধারণত অন্য ছাগল খেতে চায় না। এরা খাদ্যের তারতম্য অর্থাৎ তিতা, মিষ্টি, টক, নোন্‌তা ইত্যাদি বুঝতে পারে। এদের খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো মাঝে মাঝে বদলে দেয়া উচিত। তবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে খাদ্য মধ্যস্থিত বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানগুলোর সুষমতার হেরফের না ঘটে। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতোই ছাগলের খাদ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খণিজপদার্থ ও ভিটামিন থাকতে হবে।

নবজাতক বাচ্চা ছাগলকে জন্মের পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ওজন অনুপাতে শালদুধ পান করাতে হয়। এরপর ৪-৫ কেজি ওজন হওয়া পর্যন্ত শুধু দুধের ওপর পালন করতে হয় এবং এরপর থেকেই দৈনিক কিছু কিছু পরিমাণ তৃণজাতীয় খাদ্য মাঠে চরিয়ে খাওয়াতে হয়। গর্ভবতী ছাগলের তুলনায় প্রস্তুতির খাদ্যতালিকায় অধিক পরিমাণে দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। তবে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে পালন না করলে খাদ্যতালিকায় শস্যদানা খুব কম ক্ষেত্রেই যোগ করা হয়। খামারে ছাগলের বাচ্চা প্রসবের একমাস পূর্ব থেকে এদের খাদ্যতালিকায় দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম হারে দানাদার খাদ্য যোগ করা হয়।

ছাগলের পরিচর্যা

ছাগলকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখা এবং ছাগল থেকে সঠিক উৎপাদন পেতে হলে এদেরকে সঠিকভাবে যত্ন বা পরিচর্যা করতে হবে। পরিচর্যা বলতে সময়মতো খাবার পরিবেশন করা, গর্ভবতী ছাগীর যত্ন, অসুস্থ ছাগলকে ওষুধ খাওয়ানো, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি বুঝায়। প্রতিটি ছাগলের জন্য সাধারণ পরিচর্যা ছাড়াও গর্ভবতী ছাগী, নবজাত বাচ্চা, প্রজননের পাঠা প্রভৃতির জন্য কিছু বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়।

সাধারণ পরিচর্যাসমূহ

- ছাগলকে প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বের করে খোয়াড়ে (খোয়াড়-দিনের বেলা ছাগল রাখার জন্য বাসস্থানের সঙ্গে লাগোয়া ঘর) কিংবা ঘরের আশেপাশের খোলা জায়গায় চরতে দিতে হবে। এদেরকে ব্যায়াম ও গায়ে সূর্যকিরণ লাগানোর পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- ঘর থেকে ছাগল বের করার পর তা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- খামারে বেশি ছাগল থাকলে তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য নির্জীবাণু পন্থায় কানে ট্যাগ (tag) নম্বর লাগাতে হয়। এটা ছোট বড় যে কোনো খামারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
- ছাগলকে নিয়মিত সুষম খাবার সরবরাহ করতে হবে। খাবার ও পানির পাত্র পরিষ্কার করে তা খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি দিয়ে পূর্ণ করে দিতে হবে। প্রতিটি ছাগলকে আলাদাভাবে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর খাবার দিতে হবে। সময়ের হেরফের করা যাবে না। পাতাসহ আম-কাঠালের ডাল ঝুলিয়ে সরবরাহ করলে ভালো হয়।
- এরা পানি পছন্দ করে না। তাই নিয়মিত গোছলের পরিবর্তে ব্রাশ দিয়ে ঘষে দেহ পরিষ্কার করতে হবে। এতে লোমের ভিতরের ময়লা বেরিয়ে আসবে এবং রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। নিয়মিত ব্রাশ করলে লোম উজ্জ্বল দেখাবে ও চামড়ার মান বৃদ্ধি পাবে।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে দুগ্ধবতী ছাগীর দুধ দোহন করতে হবে। দুধ দোহনের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- ঘরের কোনো ছাগল অসুস্থ হলো কিনা তা নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনো ছাগলের মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পৃথক করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল বয়সের ছাগলকে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে ও টিকা প্রদান করতে হবে। ছাগলকে নিয়মিত জীবাণুঘটিত, পরজীবীঘটিত, অপুষ্টিজনিত, বিপাকীয় ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করাতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ছাগল পালনের পরিচর্যা নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবে।

সারসংক্ষেপ

ছাগল পালনে জায়গা কম লাগে। ছাগল দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। এদের রোগব্যাধি গরুর তুলনায় অনেক কম। এরা অত্যন্ত উৎপাদনশীল। এদেশের অসংখ্য বেকার ও ভূমিহীন লোক এবং দুঃস্থ মহিলারা ছাগল পালনের মাধ্যমে সহজেই আত্মকর্মসংস্থান করতে পারেন। ছাগল পালন করে সহজেই লাভবান হওয়া যায়। ছাগলকে তাই 'গরীবের গাভী' বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এদেশে সাধারণত ছাগলের কোন্ কোন্ ধরনের ঘর দেখা যায়?

ক) একচালা ও দোচালা
খ) দোচালা ও চৌচালা
গ) ভূমির উপর স্থাপিত ঘর ও খুঁটির উপর স্থাপিত ঘর
ঘ) শুধু ভূমির উপর স্থাপিত ঘর

২। খুঁটির উপর স্থাপিত ঘরগুলো ভূমি থেকে কত ফুট উচ্চতায় তৈরি করতে হয়?

ক) ৩.৩-৪.৯ ফুট
খ) ১.০-১.৫ ফুট
গ) ১.৫-৩.৩ ফুট
ঘ) ৩.৫-৫.০ ফুট

পাঠ-৭.৬ ভেড়া পালন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভেড়া পালনের সুবিধাসমূহ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- ভেড়ার বাসস্থান ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ভেড়ার পরিচর্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিভক্ত খুরবিশিষ্ট (Cloven hoofed) রোমন্থক (ruminant) প্রাণীদের মধ্যে ছাগল ও ভেড়া প্রথম গৃহপালিত প্রাণি। প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে প্রথমে বুনো ভেড়া ও পরে বুনো ছাগলকে পোষ মানানো হয়েছিল। এরা অত্যন্ত উপকারী প্রাণী। ভেড়া থেকে প্রধানত পশম উৎপাদন করা হয়। তাছাড়া মাংস এবং দুধও পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ভেড়ার কোনো নিজস্ব ভালো জাত নেই। এদেশের অতিরিক্ত ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া ভেড়া পালনের অনুপযোগী। শুষ্ক আবহাওয়া ও শীতপ্রধান দেশ ভেড়া পালনের জন্য উপযোগী। সেসব দেশে প্রধানত উল বা পশম উৎপাদনের জন্যই ভেড়া পালন করা হয়। এদেশে গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা দু'চারটি করে ভেড়া পালন করে থাকেন। নোয়াখালী ও বরিশালে বেশি সংখ্যায় ভেড়া দেখা যায়। আমাদের দেশের ভেড়ার লোম সাদা হলেও অযত্নের কারণে তা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এদের পশম অত্যন্ত মোটা ও নিম্নমানের যা দিয়ে কম্বল ছাড়া অন্য কিছু তৈরি করা যায় না। বাস্তবে, এদেশের ভেড়া থেকে মাংস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না বললেই চলে। বাংলাদেশে ভেড়া তেমন একটা জনপ্রিয় নয়।

ভেড়া পালনের সুবিধাসমূহ

ভেড়া পালনের বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ-

- ভেড়া তুলনামলকভাবে দামে সস্তা ও দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম। প্রতি বিয়ানে একেকটি ভেড়া ৩-৪টি বাচ্চার জন্ম দিয়ে থাকে। এরা ছাগলের মতো ১৫ মাসে দু'বার বাচ্চা দেয়। তবে, এদের পরিপক্কতা কিছুটা দেরিতে আসে।
- এরা শুধু ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। এদের জন্য তেমন কোনো সম্পূরক খাদ্য লাগে না। আগাছাপূর্ণ ভূমি পরিষ্কার করতে এদের জুড়ি নেই। এরা প্রয়োজনে যে কোনো ধরনের খাবার খেতে পারে। আগাছা, ঘাস, লতাগুল্ম, মূল, কন্দ, শস্যদানা, পাতা, ছাল, এমনকী খাদ্য ঘাটতির সময় প্রয়োজন হলে মাছ বা মাংসও খেতে সক্ষম।
- এরা ঘাস খেয়ে তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উল ও মাংসে রূপান্তরিত করতে পারে।
- ভেড়া সব সময় দলনেতাকে অনুসরণ করে, তাই এদের লালনপালন ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সহজ।
- এদের জন্য তেমন কোনো উন্নতমানের বাসস্থানের প্রয়োজন হয় না।
- ভেড়ার মাংস ও দুধ বেশ সুস্বাদু। এদের চামড়া বিক্রি করেও ভালো অর্থ আয় করা যায়।
- ভেড়ার লোম বা পশমই উল নামে পরিচিত। এগুলো অত্যন্ত দামি। উল থেকে শীতবস্ত্র, কম্বল, শাল ইত্যাদি তৈরি হয়।
- ভেড়ার গোবর ও চনা উৎকৃষ্টমানের জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ভেড়ার হাড়ের গুঁড়ো গবাদিপশু ও পোল্ট্রির খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর নাড়িভুঁড়ি ও রক্তে রয়েছে উন্নতমানের আমিষ যা হাঁসমুরগির খাদ্য বা পোল্ট্রি ফিড হিসেবে বেশ জনপ্রিয়।
- ভেড়া অত্যন্ত অর্থকরী প্রাণী।

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়া প্রধানত মাঠে চরে ঘাস খাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। রাতের বেলা মাঠেই একসঙ্গে বিশ্রাম নেয়। তবে, শীতপ্রধান দেশে শীতকালে এদের জন্য বাসস্থানের দরকার পড়ে। তাছাড়া আরও কয়েকটি কারণে ভেড়ার বাসস্থানের প্রয়োজন পড়ে। যেমন-

- ✓ রাতের বেলা ভালোভাবে বিশ্রাম নেয়ার জন্য।
- ✓ শিকারি প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

- ✓ যেসব ভেড়া বেশি দুধ দেয় তাদের দুধ দোহনের জন্য।
- ✓ গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চা ভেড়ার সঠিক পরিচর্যা করার জন্য।
- ✓ চোরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
- ✓ আমাদের মতো স্যাঁতস্যাঁতে দেশে ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ভেড়ার ঘরের ধরন

ভেড়া পালনের জন্য প্রধানত তিন ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়। যেমন- ক. খোলা বা উন্মুক্ত ঘর, খ. আধা-উন্মুক্ত ঘর ও গ. আবদ্ধ বা ছাদযুক্ত ঘর।

ক. উন্মুক্ত ঘর ঃ যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম হয় সেখানে উন্মুক্ত ঘরে ভেড়া পালন করা হয়। নির্দিষ্ট জায়গার চারদিকে বেড়া দিয়ে এই ধরনের ঘর তৈরি করা হয়। এতে কোনো ছাদ থাকে না। মেঝেতে প্রধানত খড় ব্যবহার করা হয়।

খ. আধা-উন্মুক্ত ঘর ঃ চারদিক ঘিরে বেড়া দেয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানের এক কোণে খানিকটা জায়গা ছাদ দিয়ে ঘিরে এই ধরনের ঘর তৈরি করা হয়।

গ. আবদ্ধ ঘর ঃ এই ধরনের ঘরের পুরো অংশই ছাদ দিয়ে ঘেরা থাকে। ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। মেঝে পাকা বা আধাপাকা হতে পারে। আমাদের মতো দেশে ভেড়া পালনের জন্য এ ধরনের ঘরই উপযোগী। ভেড়া সারাদিন মাঠে চরবে ও রাতের বেলা ঘরে আশ্রয় নেবে। তাছাড়া ঝড়বৃষ্টি বা খারাপ আবহাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ধরনের ঘর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ভেড়ার খাদ্যাভ্যাস

ভেড়ার খাদ্যাভ্যাস ছাগলের মতোই। এরা বিভিন্ন ধরনের তাজা ঘাস, যেমন- কাউপি, দূর্বা ঘাস, অন্যান্য ছোট ঘাস, সয়াবিন, কলাই, মটর ইত্যাদির পাতা বেশি পছন্দ করে। এদের খাদ্যে আঁশযুক্ত খাদ্যের পরিমাণ দানাদার খাদ্যের তুলনায় বেশি দিতে হয়। কোনো কোনো সময় ভেড়াকে শুধু আঁশযুক্ত খাদ্য দিয়েই পালন করা হয়। এগুলো তাজা ছাড়াও রোদে শুকিয়েও সরবরাহ করা যায়। এতে ভিটামিন-এ সহজেই সংশ্লেষণ করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের খৈল, যেমন- তিসির খৈল, সয়াবিন খৈল, তুলাবীজের খৈল থেকে এরা উন্নতমানের আমিষ পেয়ে থাকে। দানাদার খাদ্যের মধ্যে গম, যব, ভুট্টা, সরগম ইত্যাদিই প্রধান। এদের খাদ্যে সাধারণত ফিড অ্যাডিটিভস্ যোগ করা হয় না।

নবজাতক বাচ্চা ভেড়াকে ছাগলের বাচ্চার মতোই জন্মের পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ওজন অনুপাতে শালদুধ পান করাতে হয়। এরপর ছাগলের নিয়মেই ৪-৫ কেজি ওজন হওয়া পর্যন্ত শুধু দুধের ওপর পালন করতে হয় এবং এরপর থেকেই দৈনিক কিছু কিছু পরিমাণ তৃণজাতীয় খাদ্য মাঠে চরিয়ে খাওয়াতে হয়। গর্ভবতী ভেড়ীর তুলনায় প্রসূতির খাদ্যতালিকায় অধিক পরিমাণে দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। তবে, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে পালন না করলে খাদ্য তালিকায় শস্যদানা খুব কম ক্ষেত্রেই যোগ করা হয়। খামারে ভেড়ী বাচ্চা প্রসবের একমাস পূর্ব থেকে এদের খাদ্য তালিকায় দৈনিক ২০০-২৫০ গ্রাম হারে দানাদার খাদ্য যোগ করা হয়।

ভেড়ার পরিচর্যা

ভেড়াকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখা এবং এর থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পেতে হলে সঠিকভাবে যত্ন বা পরিচর্যা করতে হবে। গরু, মহিষ বা ছাগলের মতোই দৈনিক ভেড়ার পরিচর্যা করতে হবে। বিভিন্ন বয়সের ভেড়াকে প্রয়োজনমাফিক সেবাযত্ন করতে হবে। তাছাড়া গর্ভবতী, প্রসূতি, নবজাতক প্রভৃতি ভেড়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যত্ন নিতে হবে। নিম্নলিখিতভাবে ভেড়ার পরিচর্যা করা যায়। যথা–

- ➢ প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বের করে মাঠে চরার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তারা যেন পর্যাপ্ত সময় মাঠে চরতে পাড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ➢ ঘর ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। গোবর বা চনা যেন কোনো রোগের কারণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সপ্তাহে অন্তত একবার জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে ঘর জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

- এদের চিহ্নিত করার জন্য অবশ্যই কানে ট্যাগ নম্বর লাগাতে হবে।
- সাধারণত বিশেষ অবস্থা ছাড়া এদেরকে তেমন কোনো দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হয় না। তবে, গর্ভবতী, প্রসূতি, বাচ্চা ভেড়া ও প্রজননের পাঠার জন্য সম্পূরক (supplementary) খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নিয়মিত ব্রাশ দিয়ে দেহ পরিষ্কার করতে হবে। এতে উলের ভেতরের ময়লা বেরিয়ে আসবে ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। নিয়মিত ব্রাশ করলে উল উজ্জ্বল দেখাবে ও চামড়ার মান বৃদ্ধি পাবে।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ভেড়ীর দুধ দোহন করতে হবে। দুধ দোহনের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- ভেড়ার উল কাটার পূর্বে এদেরকে বহিঃপরজীবীনাশক ওষুধ দিয়ে গোসল বা ধৌত করাতে হবে অথবা এদের দেহে তা ছিটিয়ে দিতে হবে। এই সময় অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন ভেড়া সে বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে না ফেলে। এভাবে বহিঃপরজীবীনাশক ব্যবহার করলে বিভিন্ন ধরনের উকুন, আঁটালি ও অন্যান্য বহিঃপরজীবী ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি উল থেকে বিভিন্ন ময়লা দূর হয়, মাছির কীড়া দেহে বাসা বাঁধতে পারে না। এতে উলের মানও বৃদ্ধি পায়।
- নির্দিষ্ট মৌসুমে ভেড়ার দেহ থেকে উল কেটে নিতে হবে। প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভেড়াকে একাজে ব্যবহারের পূর্বে উল কেটে দিলে প্রজনন ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ে।
- প্রজননের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্য না থাকলে পুরুষ বাচ্চা ভেড়াকে সময়মতো খাঁসি করে নিতে হবে।
- ঘরের কোনো ভেড়া অসুস্থ হলো কিনা তা নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনো ভেড়ার মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পৃথক করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল বয়সের ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে ও টিকা প্রদান করতে হবে। ভেড়াকে নিয়মিত জীবাণুঘটিত, পরজীবীঘটিত, অপুষ্টিজনিত, বিপাকীয় ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করাতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ভেড়া পালনের পরিচর্যা নিয়ে আলোচনা করবে এবং জানবে।

সারসংক্ষেপ

ভেড়া দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম। এরা অত্যন্ত উপকারী প্রাণী। ভেড়া থেকে প্রধানত পশম উৎপাদন করা হয়। তাছাড়া মাংস এবং দুধও পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ভেড়ার কোনো নিজস্ব ভালো জাত নেই। এদেশে গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা দু'চারটি করে ভেড়া পালন করে থাকেন। নোয়াখালী ও বরিশালে বেশি সংখ্যায় ভেড়া দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নবজাতক ভেড়ার বাচ্চাকে জন্মের পর কত দিন পর্যন্ত শালদুধ পান করাতে হয়?

ক) ৯-১০ দিন খ) ৩-৪ দিন
গ) ৫-৬ দিন ঘ) ৭-৮ দিন

২। ভেড়ার লোম বা পশম কী নামে পরিচিত?

ক) উল খ) হেয়ার
গ) মোহেয়ার ঘ) পশম

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঈমানপুর গ্রামের আব্দুল কাদের গাভী পালনে একজন সফল খামারী। তার খামারে ৪টি সংকর জাতের দুধালো গাভী রয়েছে। কোন কোন সময় দুধের চাহিদা কম থাকায় দুধ বিক্রিতে বিপাকে পড়তে হয়। উনার দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে কোন ধারনা নেই।

ক) দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কী?
খ) দুধ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী?
গ) সনাতন পদ্ধতিতে কিভাবে দুধ সংরক্ষণ করা হয়?
ঘ) পাস্তুরিকরণের মাধ্যমে দুধ সংরক্ষণ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১। ঘ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১। ঘ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ ঃ ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ ঃ ১। ক ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ ঃ ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ ঃ ১। খ ২। ক